Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-2, Issue-iv, published on October 2022, Page No. 305–312
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

মন্বন্তর ও বাংলা সাহিত্য : কয়েকটি পর্যবেক্ষণ

জয়ী পাল
গবেষক, বাংলা বিভাগ
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেল : jayee.paul.bangla@gmail.com

Keyword
Bengal Famine, Anandamath, Bankimchandra, Causes of Famine, Abu Ishak, Surja Dighol Bari, Deshvag, Bengali Middle Class, Poverty.

Abstract
Two things become clear from the title of the article. One, Manwantar or famine, two, some context of that in Bengali literature. Why is there a famine? In general we say famine means death of thousands of people without food. Because, there was not enough food stock. But Amartya Sen, in his book 'Poverty and Famines', has pointed out the gaps and loopholes in this argument. There he clearly says that stocking of food does not mean ownership of food or right to use it. Many times during the British era, the people of India had to face famine because of this lack of rights. But people may not have to be victims of such misery anywhere else like Bengal. The first of these deadly famines occurred in 1770. It was foreshadowed from 1769 and for the next three years till 1773 this famine devastated the people of Bengal. There is a vivid picture of this massacre in the beginning of Bankimchandra's novel 'Anandmath'. Exactly the same thing happened in the 19th century in the British Empire in a country other than India. Ireland is a country suffering from severe famine and depopulation. There are discussions of the situation in Ireland in Marx's Capital Volumes I and III and in a few scattered works. In the two colonies of the English in a gap of about seventy years, the famine in which the people were losing hope of life, the British used that famine to increase the amount of their profits. After a gap of about 173 years, the people of Bengal were gifted another nightmare. In 1943 i.e. 1350 Bengal, the procession of nameless and identityless corpses on the streets. Caricatures of people, not people, were busy looking for ways to satisfy their hunger. The dead bodies lying on the road became a normal phenomenon in everyone's eyes. Alm-houses were opened in urban areas,

but they were very few compared to the starving population. Cholera was running parallel with it. This image is not only of the fifties. The picture of the famine of 1770 in Bankimchandra's 'Anandamath' was not very different. That picture of 1950 famine is featured in Vibhutibhushan Banerjee's novel 'Ashni Sanket' and in many writings of different writers. In addition, Is there no poem or story that have the shadow of these proverty and hunger? Observations about the causes of famines and how the image of society during the two famines was captured in literature, how that literature became a document of history are the primary points of our article.

Discussion

"আল্লার দুইন্যায় আর বাড়ি নাই তোর লাইগ্যা। সূর্যু দীগল বাড়ীতে দ্যাখ কি দশা অয় এইবার।"[১]

তবু খাদেম সাহসে ভর করে সূর্য দীঘল বাড়িতে সংসার পাতার স্বপ্ন দেখে। গ্রামের সকলে বলে এই বাড়িতে বাস করলে নির্বংশ হতে হবে। কিন্তু খাদেম থাকতে শুরু করে সেই বাড়িতেই। আচমকা কোথায় যেন তলিয়ে যায় তার সাহসী বুক। সাত দিনের মধ্যে ঘর দুয়ার ভেঙে সে উঠে যায় অন্যত্র। সেই বাড়ি জলের দরে কিনে নেয় জয়গুনের প্রপিতামহ। উত্তরাধিকার সূত্রে জয়গুন সেই সম্পত্তির আট আনার মালিক। বিরান এই বাড়িতে দুরুদুরু বুকে ছেলে মেয়েদের নিয়ে সংসার পাতে সে। সামনে তো অন্য কোন রাস্তা নেই। পঞ্চাশের মন্বন্তর ভাসিয়ে নিয়ে গেছে তার দাঁড়াবার ঠাঁই। জয়গুন ভাতের লড়াইয়ে হেরে যাওয়া পঞ্চাশের বাংলা। অনেক আশা ভরসা নিয়ে জয়গুনরা গ্রাম ছেড়ে শহরে গিয়েছিল। শহরের গুদামঘরে চালের প্রাচুর্য, হোটেলের খাবারের সমারোহ তাদের শুকনো জিভের বদল ঘটাতে পারেনি। ভাতের জন্য বড়লোকের দরজায় মাথা ঠুকতে ঠুকতে অবসন্ন হয়ে আসে শরীর। কুকুরের খাবার ছিনিয়ে নিতে গিয়ে ক্ষতবিক্ষত হয় মনুষ্যত্ব। জীবন-মৃত্যুর সীমানায় দাঁড়িয়ে তারা আবার শহর থেকে গ্রামে ফিরে আসে। সমস্ত বঞ্চনা চেপে রেখে, বেঁকে যাওয়া শিরদাঁড়া নিয়ে জয়গুনরা আবার কাজ খোঁজে।

"পঞ্চাশের মন্বন্তরে হোঁচট খাওয়া দেশ আবার টলতে টলতে দাঁড়ায় লাঠি ভর দিয়ে।"[২]

বাংলার বুকে এমন দুঃস্বপ্ন এই প্রথম নয়। এর অনেক বছর আগেই সাম্রাজ্যবাদের নিপুণ ছক অনুযায়ী বাংলার গ্রামগুলিকে ধীরে ধীরে শ্মশানে পরিণত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল। পদচিহ্ন গ্রামের কল্যাণীও সেদিন স্বামী মহেন্দ্রকে বলেছিল—

"আমি যতদিন পারি চালাই, তার পর তুমি মেয়েটি লইয়া সহরে যাও।"[৩]

জয়গুনের মতোই তারও মনে হয়েছিল শহরে গেলে হয়তো বা বাঁচার পথ পাওয়া যাবে। গ্রামে তাদের বেঁচে থাকা অসম্ভব। এরপর শহরে যাওয়ার পথে কল্যাণী–মহেন্দ্রকে কী কী প্রতিবন্ধকতার মধ্যে পড়তে হয়েছিল 'আনন্দমঠ'-এর পাঠকমাত্রেই তা জানা আছে। জয়গুনও তার দুই সন্তানকে নিয়ে যে ভাতের লড়াই শুরু করেছিল সেকথাও 'সূর্য দীঘল বাড়ি'র পাঠকের অজানা নয়। এখানে সেই কাহিনিগুলিকে অযথা পল্লবিত না করে বরং দেখে নেওয়া যাক ছিয়াত্তরের মন্বন্তর আর পঞ্চাশের মন্বন্তর– এই দুইয়ের মধ্যে সময়ের বিপুল পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও কোন মাপকাঠিতে কল্যাণী আর জয়গুন এক হয়ে যায়। সময়ের দ্রুত পরিবর্তন মানুষের দারিদ্রের বদল ঘটাতে পারেনা। দারিদ্র, দুর্ভিক্ষ আর মহামারীর চেহারা সর্বদেশে সর্বকালে বোধ হয় একইরকম।

দুর্ভিক্ষ হয় কেন? সাধারণ অর্থে আমরা বলে থাকি দুর্ভিক্ষ মানেই হাজার হাজার মানুষের না খেতে পেয়ে মরা। কেন? না, খাদ্যের যথেষ্ট মজুত ছিল না তাই। এই ধরণের যুক্তিতে খুব সহজেই আমরা আকৃষ্ট হই। কিন্তু এই যুক্তির ফাঁক ও ফাঁকি ধরিয়ে দিয়েছেন অমর্ত্য সেন, তাঁর 'Poverty and Famines' গ্রন্থে। সেখানে তিনি স্পষ্টতই বলেছেন খাদ্যের মজুত থাকা মানেই খাদ্যের স্বত্ব অর্থাৎ ব্যবহারের অধিকার থাকা নয়। ব্রিটিশ জামানায় একাধিকবার ভারতের মানুষকে এই অধিকারহীনতার জন্যই দুর্ভিক্ষের কবলে পড়তে হয়েছে। কিন্তু বাংলার মত এমন দুরবস্থার শিকার আর কোথাও হয়ত মানুষকে হতে হয়নি। প্রাণঘাতী এই দুর্ভিক্ষগুলির প্রথমটি হয় ১৭৭০ সালে। ১৭৬৯ থেকেই এর পূর্বাভাষ পাওয়া যাচ্ছিল

এবং পরবর্তী আরও তিন বছর ধরে ১৭৭৩ পর্যন্ত এই দুর্ভিক্ষ বাংলার মানুষকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। এই গণহত্যা, লুঠ, দারিদ্রের উজ্জ্বল ছবি রয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের শুরুতে। বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখতে গিয়ে বারবার ইতিহাসকে লঙ্ঘন করেছেন এরকম যতই অভিযোগ থাক না কেন তাঁর বিরুদ্ধে এই একটি ক্ষেত্রে তিনি অপ্রতিরোধ্য। বাংলার ইতিহাসের পরিকল্পিত, কলঙ্কময় পর্বের দলিল হয়ে আছে এই উপন্যাসটি। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের এমন নিরপেক্ষ উপস্থাপনা বাংলার আর কোন সাহিত্যিকের পক্ষে করা সম্ভব হয়েছে কিনা তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে।

ঋষি বামদেব খাদ্যাভাবে কুকুরের নাড়িভুঁড়ি খেয়ে প্রাণরক্ষা করেছিলেন। 'আনন্দমঠ'-এর কল্যাণী দেখেছিল খিদের জ্বালায় মানুষ মানুষের মাংস খেতে উদ্যোগী। কল্যাণীর গায়ের অলংকার ডাকাতেরা খুলে নিয়েছে, কিন্তু একজন তারই মধ্যে বলে ওঠে সোনা রূপোয় খিদে মিটবে না। চাল চাই। জনহীন চটির অন্ধকারে ক্লান্ত কল্যাণী কোন মানুষ দেখতে পেল না, যাদের দেখল তারা যেন ক্ষুধার অন্ধকার জমে জমে গড়ে ওঠা মানুষের প্রতিমূর্তি মাত্র। তারা কল্যাণীর শিশুকন্যাকে পুড়িয়ে খেতে চাইল তখন। কেন? সুজলা, সুফলা গ্রামবাংলা হঠাৎ রূপকথার নরখাদকে পরিণত হল কেন? ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের শিকড়ের খোঁজ করলে দেখা যায়, ১৭৬৫ সালে এলাহাবাদ চুক্তির মাধ্যমে রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের হাত থেকে চলে এল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে। ইংরেজরা এই রাজস্ব আদায়ের লোক ভোলানো নামও দিলেন – নজরানা। আর সেই সঙ্গে মুঘল আমলের রাজস্ব বাবদ ১০ -১৫ শতাংশের হারকে রাতারাতি বাড়িয়ে করে তুললেন পঞ্চাশ শতাংশ। অর্থের এই হাত বদলের সংবাদ কিন্তু বাংলার কৃষকের কাছে পৌঁছায়নি। তাঁরা নবাবের নামেই পাহাড় প্রমাণ রাজস্ব দিয়ে যেতে লাগলেন। সেকালে বাংলার কৃষকের জীবনে ফলনের ঘাটতি নতুন কিছু ছিল না। আর ঠিক সেই কারণেই রাজস্ব দানের পরও উদ্বৃত্ত ফসল সঞ্চয় করা ছিল তাঁদের জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ। কিন্তু বিপুল হারে রাজস্ব বৃদ্ধির ফলে এই সঞ্চিত উদ্বৃত্তের পরিমাণও উল্লেখযোগ্য ভাবে কমে গেল। ফলে ১৭৬৮ সালে যখন ফসলের ঘাটতি দেখা দিল, তখন এই সঞ্চিত ফসলের নিরাপদ আশ্রয়টি তাঁদের আর রইল না। এর উপর যুক্ত হল ১৭৬৯ এর অনাবৃষ্টি। এই অবস্থাই তীব্র রূপ পেল ১৭৭০-এ। মুঘল শাসকদের থেকে ক্ষমতা দখলের পর ইংরেজরা দেশ জুড়ে অর্থকরী ফসল উৎপাদনের উপর বাধ্যতামূলক ফতোয়া জারি করে। বলা বাহুল্য, এর একমাত্র কারণ ছিল রপ্তানি। এতদিন যে সব কৃষকরা ধান বা অন্যান্য ফসল চাষ করতেন, বাধ্য হয়ে তাঁরা নীল, পোস্ত এসব চাষ শুরু করলেন। ফলে দুর্ভিক্ষের সময় নিজেদের সঞ্চিত খাদ্যের ভরসা আর রইল না। ইংরেজ প্রভু তাঁর স্বভাব অনুযায়ী এদেশের কৃষকের কথা ভাবলেন না। তাদের জন্য কোনরকম ত্রাণের ব্যবস্থা হল না, উল্টে তাঁরা দুর্ভিক্ষের ভরা মরশুমে কর বাড়িয়ে যে মুনাফা করেছিলেন ১৭৭১ সালে, ১৭৬৮ সালের মুনাফাকে তা অবলীলায় ছাপিয়ে গেল। ঠিক একই ঘটনা ঘটেছিল উনিশ শতকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ভারত ছাড়া আর একটি দেশে। ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ও জনসংখ্যা হ্রাসের সমস্যায় জর্জরিত সেই দেশটি আয়ার্ল্যান্ড। মার্কসের 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থের প্রথম ও তৃতীয় খণ্ডে এবং বিক্ষিপ্ত কিছু রচনায় আয়ার্ল্যান্ডের পরিস্থিতির আলোচনা আছে। সেই প্রসঙ্গে মার্কস বর্ণনা দেন কীভাবে ১৮৪৬ সালে দশ লক্ষ লোক মারা গেলেও আয়ার্ল্যান্ডের সম্পদের ঘাটতি হয়নি। পরের কুড়ি বছর ধরে আয়ার্ল্যান্ডের ক্ষুধাতাড়িত মানুষ দেশত্যাগী হয়েছে প্রতি বছরে। তাতে আয়ার্ল্যান্ডের লাভই হয়েছে। মানি অর্ডারে বিদেশি মুদ্রা এসেছে দেশত্যাগী হতভাগ্যদের আত্মীয় স্বজনের কাছে। প্রতি বছর যত আইরিশ জন্মাত তার চেয়ে বেশি দেশত্যাগী হত, ফলে মোট জনসংখ্যা কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবাদী জমি পরিণত হয় গোচারণ ভূমিতে। ইংল্যান্ডে পশুপালন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কৃষিজাত সবুজ ফসলের উৎপাদন বাড়ে, কিন্তু আয়ার্ল্যান্ডের ক্ষেত্রে তা হয়না। আবাদি জমি পরিণত হয় পশুচারণ ক্ষেত্রে আর জলাজংলা জমি, যেখানে কিছুই হত না, সেখানে মুমূর্ষু ছোট ও মাঝারি কৃষক আলু ফলিয়ে বেঁচে থাকার প্রাণান্তকর চেষ্টা করে বাজারের প্রতিযোগিতার চাবুক খেতে খেতে।[৪] প্রায় সত্তর বছরের ব্যবধানে ইংরেজের দুটি উপনিবেশে মানুষ যে দুর্ভিক্ষের মধ্যে পড়ে জীবনের আশা খোয়াতে বসেছিল, সেই দুর্ভিক্ষকেই হাতিয়ার করে ইংরেজ বাড়িয়ে তুলেছিল তার মুনাফার পরিমাণ। পাশাপাশি একথা ভাবলেও অবাক হতে হয় যে ইংলন্ডে প্লেগ মহামারিতে এবং বাংলায় ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে দুই দেশের জনসংখ্যার প্রায় সমান অংশই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও, পরিণামে ইংলন্ডে যখন সামন্ত খামার প্রথার ক্ষয়প্রাপ্তি ঘটে তখন বাংলাদেশে পরের দেড়শ' বছর ধরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মেকি সামন্তপ্রথাই কায়েম হয়ে বসে।

কারণ বাংলার মানুষের জন্য তখন থাবা উঁচিয়ে বসেছিল ১৯৪৩ সাল। 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' আসলে 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' এর পূর্বাভাষ এনে দিয়েছিল। প্রায় ১৭৩ বছরের ব্যবধানে ইংরেজ প্রভুর কাছে বাংলার মানুষ উপহার পেল আরও এক দুঃস্বপ্ন।

১৯৪৩ অর্থাৎ ১৩৫০ এর বাংলায় রাস্তাঘাটে নামহীন গোত্রহীন মৃতদেহের মিছিল। মানুষ নয়, মানুষের ব্যঙ্গচিত্র তখন শুধু খিদে মেটানোর উপায় খুঁজতে ব্যস্ত। তেতাল্লিশের গোড়ার দিক থেকেই ভেসে আসছিল ইতিউতি অস্পষ্ট খবরগুলো। গ্রাম বাংলায় লোকের কষ্ট বাড়ছে, চুরি ডাকাতি বাড়ছে, লুঠপাঠের ঘটনা ঘটছে। ফেব্রুয়ারি থেকে জুন মাস আসতে না আসতে গোটা বাংলায় ছড়িয়ে পড়েছে আকালের ছায়া। মাদারীপুর, নারায়ণগঞ্জ, বরিশাল, নাটোর, কুমিল্লা কোন স্থানই বাদ যায়নি সেদিন সংবাদপত্রের থেকে। তেতাল্লিশ টাকা মণ চাল সেদিন বেড়ে পঁয়তাল্লিশ টাকা। তা সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার একেবারে বাইরে। পথে ঘাটে অনাহারে পড়ে থাকা মৃতদেহ তখন সকলের চোখেই স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে উঠতে থাকে। শহরাঞ্চলে লঙ্গরখানা খোলা হল, কিন্তু ক্ষুধার্থ জনসংখ্যার তুলনায় তা নিতান্তই স্বল্প। সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছে কলেরা। এ চিত্র শুধু পঞ্চাশের মন্বন্তরের নয়। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের যে ছবি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর আনন্দমঠ উপন্যাসে তুলে ধরেছেন তা এর থেকে তো খুব একটা আলাদা নয়।

> "ইতর ও বন্যেরা কুক্কুর, ইন্দুর, বিড়াল খাইতে লাগিল। অনেকে পলাইল, যাহারা পলাইল, তাহারা বিদেশে গিয়া অনাহারে মরিল। যাহারা পলাইল না, তাহারা অখাদ্য খাইয়া, না খাইয়া, রোগে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। গৃহে গৃহে বসন্তে মরিতে লাগিল। কে কাহাকে জল দেয়, কে কাহাকে স্পর্শ করে।"[৫]

পঞ্চাশের মন্বন্তরের পটভূমি রচিত হয়েছিল সেই ১৯৪১ সালেই। বলা চলে ১৯৩৯ এর সেপ্টেম্বরে জার্মানি যখন পোল্যান্ড আক্রমণ করে তখনই। ব্রিটেন এবং ফ্রান্স যখন জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তখন নিজের অজান্তেই ভারতও যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। বৃহত্তম উপনিবেশ ভারতের শ্রম ও সম্পদ এতদিন ব্রিটেন সাম্রাজ্য লালনের কাজে লাগিয়েছিল, এবার থেকে তা লাগল সাম্রাজ্য রক্ষায়। পশ্চিম দুনিয়ায় জার্মান নাৎসিবাহিনী যেমন বিদ্যুতবেগে এগিয়ে যাচ্ছিল একেকটি দেশের ওপর দিয়ে, পূর্বে জাপানি সেনাবাহিনীও তেমনই দ্রুত বেগে এগিয়ে আসছিল। রেঙ্গুনের পতন ১৯৪২ সালের ১০ মার্চ। সুতরাং বর্মা থেকে চাল আমদানি বন্ধ। সেকারণে কিছুটা ঘাটতি। এই বিয়াল্লিশেই আউশ এবং আমন ধানের উৎপাদন স্বাভাবিকের তুলনায় কিছুটা কম হল। মেদিনীপুর ও গোটা দক্ষিণবঙ্গে বিধ্বংসী ঝড়, বন্যা পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলল। কিন্তু দেখা যায় ১৯৪১-এর তুলনায় ১৯৪৩-এ মাথাপিছু খাদ্যের সম্বল ছিল শতকরা নয় ভাগ বেশি। কারণ ১৯৪০-৪১-এর চেয়ে বিঘা প্রতি বেশি উৎপাদন হয়েছিল, তা ছাড়া গম আমদানিও বেশি ছিল। তবু দুর্ভিক্ষ। কারণ সৈন্যদের জন্য গড়ে তোলা মজুত ভাণ্ডারে সেসময় বাংলার বেশির ভাগ ফসল গচ্ছিত ছিল। ফলে খোলা বাজার চালের দাম আকাশছোঁয়া । ১৯৪২ সালের ডিসেম্বরে চালের পাইকারি দর ছিল মণ প্রতি ১৩ থেকে ১৪ টাকা। ১৯৪৩ এর মার্চে তা দাঁড়ায় ২১ টাকায়, মে মাসে ৩০ টাকা, আগস্টে ৩৭ টাকা। শুধু চাল নয় চিনি, কেরোসিন, কাপড়েরও অভাব উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। নারায়ণ গঙ্গপাধ্যায়ের 'দুঃশাসন' গল্প মনে পড়বে। এই আকালের দিনে কাপড়ের ব্যবসায়ী দেবীদাস কোন গ্রামবাসীর কাতর আর্তনাদে সাড়া দেয় না। রাতভোর যাত্রা দেখে ফেরার পথে লক্ষ্মণ মুচির বাড়ি যায় সে মেরামত করতে দেওয়া জুতো ফেরত আনতে। আর ঠিক তখনই সে মুখোমুখি হয় ষোড়শী একটি মেয়ের যার গায়ে কাপড়ের ছোঁয়াটুকুও নেই। যারাই তার কাছে কাপড়ের খোঁজে গিয়েছিল কাউকে সে কাপড় দেয়নি, চড়া দামে বিক্রির সুযোগের আশায়। ফ্ল্যাশব্যাকে চলে যায় দেবীদাস। তার মনে হতে থাকে—

> "যুগের দুঃশাসন নির্লজ্জ পাশব হাতে বস্ত্রহরণ করেছে তার, তার সমস্ত লজ্জা, সমস্ত মর্যাদাকে নিষ্ঠুর উপহাসে মেলে দিয়েছে লোলুপ পৃথিবীর সামনে।"[৬]

তেতাল্লিশের এই মহাদুর্ভিক্ষের কয়েকটি লক্ষণের কথা বলেছেন অমর্ত্য সেন।[৭] প্রথমত, দুর্ভিক্ষটি ছিল সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির দ্বারা চালিত এক মুদ্রাস্ফীতির পরিস্থিতির সমসাময়িক এবং সমাজের বিভিন্ন অংশের ক্ষেত্রে বিনিময় স্বত্ব ও অন্যান্য স্বত্ব এবং মালিকানাগুলির কাঠামো বিভিন্ন হওয়ায় এই স্ফীতিকালীন দশা কারও কারও পক্ষে ডেকে এনেছিল পৌষমাস, আবার লক্ষ লক্ষ মানুষকে ঠেলে দিয়েছিল সর্বনাশের দিকে। দ্বিতীয়ত, দুর্ভিক্ষটির প্রভাব আরও জোরাল হয়েছিল শক্তিশালী ফাটকাবাজি ও মজুতদারির ফলে। এই প্রক্রিয়াগুলির সার্বজনীন প্রভাব সম্পর্কে জ্ঞানত বা অজ্ঞানত সম্পূর্ণ উদাসীন কিছু ব্যক্তি কর্তৃক এগুলি সেসময়ের বাংলায় স্থায়িত্ব পায় শুধুমাত্র আর্থিক মুনাফার উদ্দেশ্যে। এই ফাটকাবাজি ও

মজুতদারিতে উৎসাহ জুগিয়েছিল প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা। এর ফলে প্রচুর পরিমাণ খাদ্য শস্য তুলে নেওয়া হয়েছিল বাজার থেকে। এই মানবসৃষ্ট ঘাটতিতে অনুঘটকের কাজ করেছিল অন্যান্য প্রদেশ থেকে বাংলায় দানাশস্য ও চালের আমদানির ওপর সরকারী নিষেধাজ্ঞা। সর্বোপরি, বাংলার এই মহাদুর্ভিক্ষ যা অন্তত ত্রিশ থেকে চল্লিশ লক্ষ লোকের প্রাণহানির কারণ হয়েছিল, মূলত ছিল একটি গ্রামভিত্তিক ঘটনা। শহরাঞ্চলগুলি, বিশেষ করে কলকাতা, বিবিধ ভর্তুকি পুষ্ট বন্টন প্রকল্পের দ্বারা বাড়তে থাকা খাদ্যদাম থেকে পুরোপুরি সুরক্ষিত থাকায়, শহরের অধিবাসীরা দুর্ভিক্ষটিকে দেখেছিল মূলত গ্রাম থেকে নিঃস্ব মানুষজনের আগমনপ্রবাহের আকারে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'হাড়' গল্পের চাকরিপ্রার্থী যুবকটিকে মনে পড়ে। চাকরির সুপারিশ নিতে সে গিয়েছিল রাসবিহারী এভিনিউ-এ রায়বাহাদুরের বাড়িতে। ধনী রায়বাহাদুরের বাড়িতে ঢুকে কোথাও কোন অস্বাভাবিকতার চিহ্ন দেখেনি সে। গ্র্যান্ডিফ্লোরায় ঘেরা মনোরম বাড়িটির একটু দূরেই মনোহরপুকুর পার্ক। আপাতত মনোহর নয় ,কারণ বুভুক্ষু মানুষের আর্তনাদ সমস্ত পার্কটিকে মুখরিত করে রেখেছে। "নগরীর নির্মল স্ফটিক জলে জোয়ারের টানে ভেসে আসা একরাশ দুর্গন্ধ আবর্জনা। চীৎকার করছে, কলহ করছে, পরস্পরের মাথা থেকে উকুন বাছছে, জানোয়ারের মতো ঝুঁকে পড়ে কালো জিভ দিয়ে খাচ্ছে হাইড্রেন্টের ময়লা জল"[৮] আর চার দেওয়ালের নিশ্ছিদ্র নিরাপদ ঘেরাটোপে বসে রায়বাহাদুরের মনে হয়,

> "পার্কের ওই ডেসটিচ্যুটগুলোর জ্বালায় রাতে আর ঘুমোনো যায় না। বোধ হয় খাবার দাবার কিছু মিলেছে তাই এই চীৎকার। খেতে না পেলে চীৎকার করবে, খেতে পেলেও তাই।"[৯]

সাহিত্য আর ইতিহাসের সার্থক মেলবন্ধন এখানেই। বুভুক্ষু মানুষের জীবনের ইতিহাস আশ্চর্য নিপুণতায় সাহিত্যের পাতায় গেঁথে রেখেছেন বাংলার সাহিত্যিকরা। পাশাপাশি, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের প্রবণতা একটু আলাদা হয়ে ধরা পড়ে এই প্রসঙ্গে। তখন রায়বাহাদুরের মত শহরের বিত্তশালী বা দেবীদাসের মত গ্রামীণ ধনী ব্যবসায়ী দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস থেকে মুক্ত ছিল। 'আনন্দমঠ' এর মহেন্দ্র কিন্তু ধনী গৃহস্থ, মোটেই সহায় সম্বলহীন কৃষক নয়। উপরন্তু তাঁর বাড়িতে গচ্ছিত আছে পূর্বপুরুষের প্রভূত সম্পত্তি। কিন্তু তাই বলে সে গা বাঁচিয়ে থাকতে পারেনি। তার পরিবারও ধ্বংসের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছিল। স্ত্রী কন্যার হাত ধরে অন্ধকার পথে হারিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না তার সামনে। পঞ্চাশের মন্বন্তর বড়লোকের গায়ে আঁচ লাগতে দেয়নি। দুই ক্ষেত্রেই গ্রাম থেকে শহরে এসেছে মানুষ বাঁচার আশায়, কিন্তু দ্বিতীয় দুর্ভিক্ষটি বড়লোকের ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করতে পারেনি। এমনকি গ্রামবাংলার জনসাধারণের ভিতরেও সকল গোষ্ঠী দুর্ভিক্ষের ফলে সমানভাবে প্রভাবিত হয়নি। অমর্ত্য সেন দেখিয়েছেন, বাংলার দুর্ভিক্ষে গ্রামবাংলার মধ্যে সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল কৃষি-শ্রমিক, মৎস্যজীবী, পরিবহনকর্মী, হস্তশিল্পী এবং অন্যান্য ক্ষেত্রের শ্রমিকরা। একথা পঞ্চাশেও সত্যি, ছিয়াত্তরেও। আবারও ফিরে যেতে হবে 'আনন্দমঠ'-এ। উপন্যাসের শুরু হচ্ছে জনমানবহীন গ্রামের বর্ণনা দিয়ে।

> "বাজারে দোকান বন্ধ, দোকানদার কোথায় পলাইয়াছে তার ঠিকানা নাই। তন্তুবায় তাঁত বন্ধ করিয়া গৃহপ্রান্তে পড়িয়া কাঁদিতেছে, ব্যবসায়ী ব্যবসা ভুলিয়া শিশু ক্রোড়ে করিয়া কাঁদিতেছে। দাতারা দান বন্ধ করিয়াছে, অধ্যাপকে টোল বন্ধ করিয়াছে, শিশুও বুঝি আর সাহস করিয়া কাঁদে না।"[১০]

সময় পাল্টানোর সঙ্গে সঙ্গে দুর্ভিক্ষের কারণ পাল্টালো, কিন্তু জীবনের ধ্বংসের ছবি খুব বেশি বদলাল না। ঢাকা জেলার ছোট্ট গ্রাম রণছা। কাঁচা চামড়া, বেত আর বাঁশের কাজই ছিল তাদের মূল পেশা। সেই সঙ্গে ঢাক ও সানাই বাজিয়েও বেশ খানিকটা রোজগার করত তারা। সেই অঞ্চলে চালের দাম বেড়ে দাঁড়িয়েছিল প্রতি মণ একশ টাকা। এরপরেই সেই গ্রামটি ধীরে ধীরে নিশ্চিহ্ন হতে থাকে। রোজগারের সমস্ত উপায় বন্ধ হতে থাকে। প্রতি ভিটেয় গজিয়ে ওঠে জঙ্গল। নামকরা ঢাক সানাই তবলা বাজিয়েরা অনাহারে প্রাণ দিয়েছে, সেই সঙ্গে চির অবলুপ্তির পথে এগিয়ে গেছে বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতির ছোটখাট অনুষঙ্গগুলিও।[১১] বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন মেলা শ্রীনগরের রথযাত্রা। চিত্তপ্রসাদ লিখছেন, আকালের সময় যখন তিনি মেলায় গিয়েছিলেন, দেখেছিলেন কুমোর, তাঁতি, মাঝি কেউই আর নিজের পেশায় নেই। খাদ্যের লড়াইয়ের সঙ্গে তখনও পুরোদমে চলছে বসন্তের প্রকোপ। আরও লজ্জাজনক ইতিহাসের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন ভবানী সেন।[১২]

> "মানুষ গোরু বেচিল, লাঙ্গল জোয়াল বেচিল, বীজধান খাইয়া ফেলিল, ঘরবাড়ী বেচিল। তারপর মেয়ে বেচিতে আরম্ভ করিল, তারপর ছেলে বেচিতে আরম্ভ করিল, তারপর স্ত্রী বেচিতে আরম্ভ করিল।"[১৩]

একথা আনন্দমঠ প্রণেতার কাছে আমরা আগেই শুনেছি। এছবি ছিয়াত্তরের। পঞ্চাশের ছবিও অদ্ভুত ভাবে মিলে যায় এর সঙ্গে। ভবানী সেন লিখছেন চট্টগ্রামে তখন মেয়ে বিক্রির ব্যবসা। পাহাড়তলি স্টেশনের কাছে বাজারে এসে দেখলেন তিনি প্রত্যেকটি পল্লীই প্রায় অবারিত যৌনাচারের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। দুর্ভিক্ষে মেয়েদের আশ্রয় গেছে, আব্রু গেছে। যারা অনাহারে মরেছে, তাদের জীবন যুদ্ধ সেখানেই শেষ হয়েছে। যারা মরেনি তারা অনেকেই এই রাস্তায় বাঁচার উপায় খুঁজতে মরিয়া। মেয়ে বিক্রির বেশ কয়েকটি কদর্য কাহিনি তুলে ধরেছেন তিনি তাঁর লেখায়। বোঝা যায় খাদ্যের আকাল বাংলার সভ্যতা সমাজের মেরুদন্ড ভেঙে দিয়েছে। মানুষ তখন বাঁচার আশায় ফিরে গেছে আদিম বর্বরতার কাছে। নারীর বিপন্নতা ও অসহায়তার নতুন মাত্রার খোঁজ পাওয়া যায় এই প্রসঙ্গটির আলোচনায়। আর্থিক, সামাজিক ভাঙন তখন মধ্যবিত্ত শুচিতা ও নীতিবোধের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে 'অক্টোপাসের পঙ্কিল বাহু'। এই অভিঘাতকে কেন্দ্র করেই মুছে যাচ্ছিল একান্নবর্তী পরিবারের ঐক্য। চোখের সামনে মেয়েদের জগৎ বদলে যাচ্ছিল অত্যন্ত দ্রুত গতিতে। টাকার প্রয়োজনে, বাঁচার প্রয়োজনে মেয়েদের অন্দরের ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে আসার প্রবণতা মন্বন্তরের আর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'যায় যদি যাক' উপন্যাসের সেবা দুর্ভিক্ষের দিনে স্বামী সুজনকে বাঁচানোর জন্য বারিধিকে নিজের শরীর বিক্রি করতে কুণ্ঠিত নয়। বারিধির শত প্রলোভন, সবকিছু উজাড় করে তাকে পাওয়ার লোভ, লালসাকে তুচ্ছ করেও অনোন্যপায় সেবা স্বীকার করে নেয় ভালোবাসাহীন শরীরের সম্পর্ক। তার সতীত্বের সংস্কার অন্যরূপ নিয়েছিল। সুজনও সেদিন সেবাকে ফেরায়নি। পুরনো সামাজিক বিধিনিষেধ অগ্রাহ্য করে সম্পূর্ণ নতুন যুগের উপযুক্ত অনুসাশনের দ্বারা চালিত হয়ে সে বলেছে সন্তান কখনও অবৈধ হয় না। এই নতুন সময়ের কথা আছে তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মন্বন্তর' উপন্যাসে। এই উপন্যাসটির পটভূমি সম্পর্কে বলতে গিয়ে সেই সময়ের প্রাঞ্জল বিবরণ দিয়েছেন তিনি,

> "ঝড় জল প্লাবন দুর্ভিক্ষ মহামারি অব্যাহত গতিতে বাংলার সমাজজীবনকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। আজ বাংলার চিত্রশিল্পীর মডেল হয়ে উঠেছে– নরকঙ্কাল, গলিত শব, তার চারিপার্শ্বে ক্ষুধার্ত মাংস ভুক কুকুর শেয়াল শকুন; সাহিত্যিকের দৃষ্টির সম্মুখ থেকে চিরন্তন মানবতার মহাপ্রকাশ আজ স্তব্ধ হয়ে গেছে। নিছক জীবন তাড়নায় মা কোলের ছেলেকে ফেলে পালাচ্ছে, মানুষ সন্তানকে হত্যা করছে, স্ত্রী কন্যা ভগ্নী বিক্রি করছে মানুষ, নারী নিজেকে বিক্রি করছে।"[১৪]

এই বিষয়গুলি কাজ করেছে 'মন্বন্তর' উপন্যাসের প্রেক্ষাপট হিসেবে। দেবপ্রসাদের ভাষ্যে ধরা পড়েছে দুর্দিনের সেই চিত্র।

> "কত সাধ কত আশা নিয়ে এরা সব এখানে এসে আপন কর্মক্ষেত্র তৈরি করে নিয়ে জীবনের বীজ বপন করেছিল, কারও বীজ হতে অঙ্কুর হয়েছিল, অঙ্কুর হতে মেলেছিল পাতা – কারও কারও জীবন তরীতে ফুল ধরেছিল, ফলভারে সমৃদ্ধ হয়েছিল কত জীবনতরু, সব ভেঙেচুরে ওলট পালট করে দিয়ে গেল কাল যুদ্ধ। আবার কত নিরন্ন এই মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ করে ছুটে আসছে কলকাতায়, দুটো উচ্ছিষ্টের প্রত্যাশায়।"[১৫]

গোপাল হালদারের ত্রয়ী উপন্যাস 'পঞ্চাশের পথ', 'তেরোশো পঞ্চাশ', 'ঊনপঞ্চাশী', বিভূতিভূষণের 'অশনি সংকেত' ব্যতিরেকে এই সময়ের স্পষ্ট চিত্র পাওয়া অসম্ভব। বাদ রাখা যাবে না সুবোধ ঘোষের 'তিলাঞ্জলি'-কে, যেখানে রয়েছে মহাদুর্ভিক্ষের বছরে নারীর বিপন্নতার অন্য এক মাত্রা। মা তার অপুষ্টিতে ভোগা শিশুকে বন্ধক রাখে আর এক নারীর কাছে। সেই টাকায় নিজে খেয়ে প্রাণরক্ষা করে। আর সেই নারীটিও অপুষ্ট শিশুটিকে দেখিয়ে ভিক্ষে করে। জীবনের এই নিষ্ঠুর বাস্তবতার সামনে পাঠককে দাঁড় করিয়েছেন তিনি। সাহিত্য কীভাবে সময়ের দলিল হয়ে ওঠে, বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী সেই পথ দেখিয়ে দিয়েছিল। সেই পথের উত্তরাধিকারের মান রেখেছেন বাংলার সাহিত্যিকরা। অসংখ্য গল্প,উপন্যাসে কোন আবরণ না রেখে মানুষের কথা বলেছেন তাঁরা। পোড় খাওয়া জীবনের গল্প ইতিহাসে থাকে না। ইতিহাসের এ এক অদ্ভুত মূক বধির অবস্থান। বাংলার সাহিত্যিকরা সেই পোড় খাওয়া জীবনকে ধরে রেখেছেন, ভুলতে দেননি আমাদের অতীতকে , আমাদের শিকড়ের অবমাননাকে। তাই ছিয়াত্তর হোক বা পঞ্চাশ – বাংলার দুর্দিনের চালচিত্র পেতে গেলে শিল্পী সাহিত্যিকদের শরণাপন্ন হতেই হয়।

বৈদিক যুগে মানুষ সব পেয়েছির দেশে থাকত এমন একটি কল্পকথা আমাদের সমাজে চালু আছে। কল্পকথাই, কারণ সত্যিই তাই হলে বেদ উপনিষদে এমনভাবে অন্নকে ব্রহ্ম রূপে দেখার কথা বলা হত কি? অন্নের অভাব সেই যুগের ব্রাহ্মণ চণ্ডাল নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের জীবনেরই বহমান সত্য ছিল, আর তাই এত প্রার্থনা। 'অন্ন আদিত্য, অন্ন মরুদগণ,

অন্ন গর্ভ', 'আমাদের পথ যেন সুগম ও অন্নযুক্ত হয়', 'যেন অন্নের ওপরে আমাদের অধিকার থাকে, যেন অন্নের সবচেয়ে নিকটে থাকতে পারি বেদ উপনিষদের এই শিক্ষা আসলে অন্নের অভাববোধ থেকেই জাত। চর্যাপদের কবিও শুনিয়েছেন জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় রসদের সংস্থান করতে না পারা বিষণ্ণ মানুষের কথা –

"টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী/হাঁড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী।"[১৬]

চণ্ডীমঙ্গলের কবি ফুল্লরার জবানিতে সেই সময়ের সামাজিক ও আর্থিক মাপকাঠিতে অনেক নিচে থাকা ব্যাধজীবনের দারিদ্রের কথা শুনিয়েছেন। অন্নদামঙ্গলের কবি রাজনৈতিক সামাজিক বিশৃঙ্খলার মধ্যে দাঁড়িয়ে কাব্যরচনাকালে ঈশ্বরী পাটনীর মত সাধারণ গ্রামীণ মাঝির চোখে এঁকে দিয়েছিলেন ভবিষ্যতের স্বপ্ন। তার সেই স্বপ্নই রূপ পেয়েছিল দেবী অন্নপূর্ণার কাছে কাতর প্রার্থনায়– 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'। সেই সময়ের দীর্ঘ ব্যবধানে বিশ শতকের মন্বন্তর কবলিত কবি লেখেন,

"মাগো এত ডাকি খিদের দেবতাটাকে/বেশি নয়, যেন দু'বেলা দু'মুঠো নুন-মাখা ভাত রাখে।"[১৭]

দেবতারা কি ডাক শুনেছেন? বাংলার মানুষের ভাতের খনির সন্ধানে যাত্রার কি শেষ হয়েছে? শাসকের কারচুপিতে যখন লক্ষ লক্ষ প্রান্তজন প্রাণ হারিয়েছে তখন কোথায় থেকেছে দেশের দেবতারা ? ছিয়াত্তর বা পঞ্চাশের মন্বন্তর দেবতাদের সেই চরম উদাসীনতাকে প্রমাণ করে, দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তাদের ব্যর্থতাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। আর শেষ পর্যন্ত বিশ শতকের ক্ষুধার্ত, মন্বন্তর পীড়িত মানুষের উপলব্ধিকে মিলিয়ে দেয় চর্যাপদের কবির অনুভবের সঙ্গে –

"জো সো বুধী সৌ নিবুধী। জো সো চৌর সৌ দুষাধী।।" [১৮]

যার শুভ বুদ্ধি আছে , সে আসলে বোকা। যে আসলে চোর , সেই দারোগা। মূল্যবোধ বিপর্যস্ত হলে সমাজে এমন অঘটনই সত্য হয়ে দাঁড়ায়। ইংরেজ শাসনে বারবার গ্রামবাংলার দুর্ভিক্ষে ছারখার হয়ে যাওয়া মানুষের আত্মিক উচ্চারণ হয়ত এই কথাক'টিই। এখানেই নিজের মাংসে নিজের শত্রু হয়ে ওঠা চর্যাপদের মেয়েটি আর কল্যাণীর শিশুকন্যা এক হয়ে যায়। ফুল্লরার সঙ্গে এক হয়ে যায় জয়গুন। গোটা গ্রামবাংলা হয়ে ওঠে যেন এক সূর্য দীঘল দেশ।

তথ্যসূত্র :

১. ইসহাক, আবু, সূর্য দীঘল বাড়ী, চিরায়ত প্রকাশনী : কলকাতা ১৯৯২, পৃ. ১০
২. তদেব, পৃ. ৯
৩. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, আনন্দমঠ, উপন্যাসসমগ্র, কামিনী প্রকাশনী : কলকাতা ১৯৮৬, পৃ. ৬৯২
৪. মার্কস, কার্ল, ক্যাপিটাল, তৃতীয় খণ্ড, মস্কো : ১৯৫৯, পৃ. ৬১১
৫. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, আনন্দমঠ, উপন্যাসসমগ্র, কামিনী প্রকাশনী : কলকাতা ১৯৮৬, পৃ. ৬৯১
৬. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, দুঃশাসন, শ্রেষ্ঠ গল্প, অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য (সম্পা) প্রকাশ ভবন : কলকাতা অগ্রহায়ণ ১৩৬১, পৃ. ৫৮
৭. মুখোপাধ্যায়, সোমেশলাল, গণ-অনাহার ও দুর্ভিক্ষের অমর্ত্য ব্যাখ্যা এক পুনরবলোকন, ক্ষুধার্ত বাংলা, মধুময় পাল (সম্পা), দীপ প্রকাশন : কলকাতা ২০১৩, পৃ. ১৭৭
৮. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, হাড়, শ্রেষ্ঠ গল্প, অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য (সম্পা), প্রকাশ ভবন : কলকাতা অগ্রহায়ণ ১৩৬১, পৃ. ৩০
৯. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, হাড়, শ্রেষ্ঠ গল্প, অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য (সম্পা), প্রকাশ ভবন : কলকাতা অগ্রহায়ণ ১৩৬১, পৃ. ৩৪
১০. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, আনন্দমঠ, উপন্যাসসমগ্র, কামিনী প্রকাশনী : কলকাতা ১৯৮৬, পৃ. ৬৯১
১১. চিত্তপ্রসাদ, এই বাদ্যকরেরা ছিল ঢাকা জেলার গর্ব, ক্ষুধার্ত বাংলা, মধুময় পাল (সম্পা), দীপ প্রকাশন : কলকাতা ২০১৩, পৃ. ৫৯
১২. সেন, ভবানী, চট্টগ্রামে মেয়ে বিক্রির ব্যবসা, ক্ষুধার্ত বাংলা,মধুময় পাল (সম্পা), দীপ প্রকাশন : কলকাতা

২০১৩, পৃ. ৫১

১৩. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, আনন্দমঠ, উপন্যাসসমগ্র, কামিনী প্রকাশনী : কলকাতা ১৯৮৬, পৃ. ৬৯১

১৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশংকর, মন্বন্তর ও সাহিত্য, অগ্রন্থিত রচনাবলী, বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স : কলকাতা ১৪১৬, পৃ. ১৮৯

১৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশংকর, জগদীশ ভট্টাচার্য (সম্পা), পঞ্চম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স : কলকাতা ১৪১১, পৃ. ২৪৭

১৬. দাশ, নির্মল, চর্যাগীতি পরিক্রমা, দে'জ : কলকাতা ১৯৯৭, পৃ. ৭১

১৭. চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র, কালো বস্তির পাঁচালি, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ : কলকাতা ১৯৯৪, পৃ. ৫৯

১৮. দাশ, নির্মল, চর্যাগীতি পরিক্রমা, দে'জ : কলকাতা ১৯৯৭, পৃ. ৭১